সিক্রেটস অব জায়োনিজম

(বিশ্বব্যাপী জায়োনিস্ট ষড়যন্ত্রের ভেতর-বাহির)

হেনরি ফোর্ড

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

এক সন্ধ্যায় ছেলেটা অফিসে এলো। সুদর্শন তরুণ, চেহারায় একটা মায়ামাখা দ্যুতি। কথা বলছেন খুবই বিনয়ী কণ্ঠে। নাম ফুয়াদ। পড়েন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথম কয়েক মিনিটেই টের পেয়েছিলাম—এই ছেলের মাথায় বিশেষ কিছু আছে।

আমতা আমতা করে বলল– 'আমি একটা বই অনুবাদ করেছি, *গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স*-কে দেখাতে চাই।' নীলক্ষেত থেকে সবুজ কভারে অনুবাদ গ্রন্থটি বাঁধাই করে নিয়ে এসেছিল ফুয়াদ। ওপরে লেখা-'The International Jew'। স্বাগত জানিয়ে বললাম– এখনই বইটি দেখা একটু কঠিন; আপনি কি বইটি সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন, প্লিজ?'

খানিক সময় নিয়ে ফুয়াদ ভাই শুরু করলেন। বিশ্বখ্যাত গাড়ি কোম্পানি ফোর্ড এবং তার মালিক হেনরি ফোর্ড সম্পর্কে প্রথমে বললেন। এরপর ফোর্ড কেন বইটি লিখলেন, তা জানালেন। কীভাবে বইটি আমেরিকার বুক মার্কেট থেকে হাওয়া হয়ে গেল, ৫৫ বছর পরে আবার প্রকাশিত হলো, তা জানলাম।

ফুয়াদ ভাইয়ের ৩০ মিনিটের ভূমিকা শুনে 'থ' বনে গেলাম। কী বলে এই তরুণ! জায়োনিজমের বিরুদ্ধে কত-শত মানুষ বলছে, লিখছে; এমন কথা তো কখনো কোথাও শুনিনি! হুংকার শুনি, প্রতিহতের ডাক শুনি, ষড়যন্ত্রতত্ত্ব শুনি, কিন্তু জায়োনিস্ট ম্যাকানিজম কখনোই এভাবে কোথাও থেকে বুঝিনি। ভাবনার জগতে হারিয়ে গেলাম। জায়োনিস্টরা তাহলে এভাবে ফাংশন করে! না জানি কখন আমরাও তাদের শিকারে পরিণত হই!

সেদিনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম—আমরা এই অনুবাদগ্রন্থ বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেবো। কাজ শুরু হলো। বইটি প্রকাশের পূর্ব মুহূর্তে ফুয়াদ ভাইয়ের কাছে বিনয়ের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তিন-তিনবার পাণ্ডুলিপি ফেরত দিয়েছি। নতুন করে কাজ করে নিয়েছি। অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে অনুবাদক কাজ করে দিয়েছেন, উদ্যম হারাননি। পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়ার পর এক বছর পর্যন্ত প্রকাশনা সংস্থার অফিসে এলেও যে তরুণের মুখে হাসি লেগেই থাকে, তাকে কী বলে ধন্যবাদ দেওয়া যায়?

আলহামদুলিল্লাহ! ফেব্রুয়ারি, ২০২০-এর বইমেলায় আসছে *সিক্রেটস অব জায়োনিজম : বিশ্বব্যাপী জায়োনিস্ট ষড়যন্ত্রের ভেতর-বাহির*। মূল ইংরেজি বই চার খণ্ডের, আমরা বাংলাভাষায় এক খণ্ডেই প্রকাশ করছি। মূল বইয়ের ৮০ পর্ব থেকে কিছু পর্ব বাদ দেওয়া হয়েছে; কারণ, সেসব আলোচনা একান্তই আমেরিকার সমাজ ও নাগরিকদের জন্য বিশেষায়িত। বইয়ের কলেবর না বাড়ানোর

একটা প্রচেষ্টা ছিল। আলোচনার প্রাসঙ্গিকতার প্রয়োজনে কিছু কলামের ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করা হয়েছে। ভিন্ন আলোচনার টপিক নিয়ে আমরা অধ্যায়ের নামকরণ করেছি। ১৯২০ সালে লেখা এই বইয়ে যেসব ডাটা ছিল, তার হালনাগাদ তথ্য রেফারেন্সসহ সংযুক্ত করা হয়েছে। অনুবাদক যেসব কথা যুক্ত করেছেন, তা বক্স আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেন পাঠকবৃন্দ সহজেই পার্থক্য খুঁজে নিতে পারেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! একটা দারুণ গ্রন্থ এখন আপনাদের হাতে। আপনি অবাক চোখে জায়োনিস্ট ম্যাকানিজম পড়বেন, শিহরিত হবেন, আঁতকে উঠবেন। আগামী দিনের পৃথিবীকে যারা নেতৃত্ব দিতে চান, অবশ্যই তাদের এই গ্রন্থে একবার চোখ বুলিয়ে যাওয়া উচিত। আপনার চারপাশের সচেতন মানুষদের জায়োনিস্ট ম্যাকানিজম নিয়ে সতর্ক করবেন– প্রত্যাশা এটাই।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

অনুবাদকের কথা

কেন ইহুদিদের নিয়ে বিশ্বজুড়ে এত আলোচনা-সমালোচনা? প্রশ্নটি একই সাথে জটিল ও সহজ। আপনারা নিশ্চয় সবাই একমত হবেন, আন্তর্জাতিক বহু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান এই আলোচনাতেই নিহিত। তাদের নিয়ে মানবতাবাদী বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ও কৌতূহলীদের গবেষণার অন্ত নেই। কীভাবে হাজার বছরের একটি জাতি আজকের দুনিয়াতে প্রতাপশালী ভূমিকায় আবির্ভূত হলো, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের কৌতূহল থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলেও সত্য, এই অনুসন্ধানে ইহুদিদের পক্ষ হতে তেমন কোনো সহযোগিতা পাওয়া যায় না। তাদের ব্যাপারে অপ্রীতিকর কিছু প্রকাশ পাক, এমনটি তারা কখনোই চায় না; হোক তা সত্য বা মিথ্যা। তাদের আকাঙ্ক্ষা– সাধারণ মানুষ সেভাবেই তাদের ইতিহাস জানুক, যেমনটা তারা চায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হলোকাস্ট এমনই একটি উদাহরণ।

অনেকে বলে এবং স্বয়ং ইহুদিরাও দাবি করে, তাদের পেছনে অদৃশ্য একটি শক্তির আশীর্বাদ রয়েছে; যার কল্যাণে বহু নিপীড়ন সহ্য করেও তারা আজ ক্ষমতাধর জাতিতে পরিণত হয়েছে। হেনরি ফোর্ড তাঁর *The International Jews* বইয়ে উপস্থান করেছেন– কী সেই অদৃশ্য শক্তির স্বরূপ!

ইহুদিদের বলা হয় প্রোপাগান্ডা মেশিন। এই মেশিন তারা দুই কাজে ব্যবহার করে। প্রথমত, নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠার কাজে। দ্বিতীয়ত, অন্যদের দ্বারা প্রচারিত যেকোনো মতবাদের বিরুদ্ধে। এই প্রোপাগান্ডা মেশিনের মুখোমুখি হতে হয়েছিল হেনরি ফোর্ডকেও।

প্রথম দিকে ১৯১৯ সালের মে মাস হতে *The Dearborn Independent* পত্রিকার মাধ্যমে তিনি নিয়মিত ইহুদিদের বিতর্কিত বিষয়ের ওপর আর্টিকেল প্রকাশ করতেন। ১৯২০ সালের মাঝামাঝি থেকে তাঁর প্রতিটি আর্টিকেল ৯ লাখ কপি পর্যন্ত বিক্রি হতো। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তা পঠিত হতো। ইহুদিরা এ পর্যায়ে প্রোপাগান্ডা মেশিন নিয়ে মাঠে নেমে পরে। সত্যি বলতে বিশ্ব গণমাধ্যমের একটি বড়ো অংশ তখন থেকে আজ পর্যন্ত তাদেরই নিয়ন্ত্রণে রয়ে গেছে। তারা দাবি করে, অবান্তর ও ভিত্তিহীন তথ্যের মাধ্যমে হেনরি ফোর্ড সাধারণ মানুষের মনে এন্টি-সেমিটিক ক্ষোভ উসকে দিচ্ছে। একসময় মি. ফোর্ড থেমে যেতে বাধ্য হন। বইটিসহ তাঁর পত্রিকা প্রতিষ্ঠানকে নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু বইটি সাধারণ মানুষের মনে যে দীর্ঘকালব্যাপী ইহুদিবিরোধী চেতনার দাগ কেটে গেছে, তা মুছে দিতে এই প্রোপাগান্ডা মেশিনকে আরও বহু বছর চলমান রাখতে হয়।

এ বইয়ের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের একটি হলো– Protocols of the Elders of Zion। ইহুদিরা আজও এটিকে জার সাম্রাজ্য কর্তৃক ইহুদিবিরোধী প্রচারণার অংশ বলে দাবি করে থাকে। কিন্তু প্রটোকলগুলোতে যা দাবি করা হয়েছে, তার সত্যতা কতটুকু? তার জবাব একবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটের সাথে তুলনা করলেই পাওয়া যাবে। এ ছাড়াও চলচ্চিত্রশিল্প, ক্রীড়াশিল্প, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, কূটনীতি, যুদ্ধনীতি, মাদকশিল্প ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ে তাদের যে আধিপত্য, তার প্রারম্ভ যেভাবে হয়েছে– তা বিস্তারিত এই বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। বইটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার প্রায় ১০০ বছর পর পুনরায় ভিন্ন একটি ভাষায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। তবে সময়ের প্রয়োজনে মূল আলোচনার পাশাপাশি বিগত দশকগুলোতে ঘটে যাওয়া প্রাসঙ্গিক কিছু আলোচনা বইটিতে যুক্ত করা হয়েছে।

একটা কথা বলে রাখছি। পুরো ইহুদি জাতিগোষ্ঠীকে হেয় করা কখনোই এ বইটির উদ্দেশ্য ছিল না। তখনকার মতো এখনও অনেক বিখ্যাত ও কম-বিখ্যাত ইহুদি খুঁজে পাওয়া যাবে, যারা মানবাধিকারের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে; এমনকী তারা নব্য ইজরাইল রাষ্ট্রেরও বিরুদ্ধে। বইটির অধিকাংশ স্থানে যে ইহুদি জাতিয়তাবোধ ও চেতনার কথা উপস্থাপন করা হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে জায়োনিজমকে বোঝাচ্ছে। কিন্তু মূল বইয়ের বেশিরভাগ স্থানে 'ইহুদি' শব্দটি উল্লেখ থাকায় এখানেও তা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

আরেকটি বিষয় বলে রাখা ভালো– বইয়ের কলেবর ছোটো রাখা ও সুখপাঠ্য করার স্বার্থে মূল বইয়ের চার খণ্ডের পরিবর্তে তথ্য-উপাত্ত ঠিক রেখে মাত্র একটি খণ্ডে উপস্থাপন করা হয়েছে। সাথে সাথে বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের সাথে প্রাসঙ্গিকতা রক্ষার জন্য কিছু কিছু স্থানে নতুন তথ্য উৎসসহ সংযোজন করা হয়েছে। তবে যেকোনো ভুলকেই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ থাকল। অতিরঞ্জিত হলে তা জানানোর অনুরোধ করছি, যেন পরবর্তী সংস্করণে পরিমার্জিত আকারে পেশ করা যায়।

আশা করি বইটির অনূদিত সংস্করণটি পাঠকদের নিকট কিছু ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপনের পাশাপাশি মনোরঞ্জনেরও কাজ করবে। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের মনে এ বইটি ইহুদি বিতর্কের বিভিন্ন দ্বার উন্মোচনে সাহায্য করবে।

ফুয়াদ আল আজাদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১০ জানুয়ারি, ২০২০

ভূমিকা

১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকাল। ইউরোপজুড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের হাওয়া বইতে শুরু করে। ২৮ জুন, ১৯১৪, অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী Archduke Franz Ferdinand সার্বিয়ান আততায়ীর হাতে নিহত হলে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এরপর হাঙ্গেরি যখন সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখন ইউরোপ দুই ভাগ হয়ে যায়। একপক্ষ জার্মানি-হাঙ্গেরি-অস্ট্রিয়া-অটোমানদের কেন্দ্রীয় শক্তি এবং অপর পক্ষ রাশিয়া-ব্রিটেন-ফ্রান্স-সার্বিয়ানদের মিত্রশক্তি। তখন জার্মানদের দাপটে মিত্রশক্তির খাবি খাওয়া অবস্থা।

তারা যে প্রযুক্তির সাবমেরিন নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে আসে, তা ছিল সেই যুগের বিস্ময়। ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীকে তারা তুড়ি মেরে গুঁড়িয়ে দেয়। একদিকে, অভ্যন্তরীণ সেনা বিদ্রোহের আশঙ্কায় ফ্রান্স তখন নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত। একই সময় রাশিয়ার আকাশে জমতে শুরু করে বলশেভিক বিপ্লবের কালো মেঘ। এমনিতেই জার সম্রাট কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এমন সব তরুণদের পাঠিয়েছিলেন, যাদের ছিল না কোনো সামরিক প্রশিক্ষণ। ফলে বস্তাপঁচা লাশ হয়ে দেশে ফিরে আসে তারা। শুরু থেকেই মিত্রশক্তির ছিল তাল-মাতাল অবস্থা।

অপরদিকে, ১৯১৬ সালের গ্রীষ্ম পর্যন্ত জার্মানির অভ্যন্তরে একটি গুলি পর্যন্ত ফোটেনি। তারা যেন হেসে-খেলে যুদ্ধে জিতে যাচ্ছিল। ব্রিটেনকে শান্তি আলোচনায় আসার প্রস্তাব দেয় তারা। ব্রিটেনও ভাবছিল, একা একা এই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। কারণ, তখন তার মিত্রশক্তিরা নিজ দেশের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ সামলাতে ব্যস্ত। ব্রিটেন শান্তি আলোচনায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

কিন্তু জার্মান জায়োনিস্টরা ব্রিটেনের সামরিক বাহিনীকে আশ্বস্ত করে, তারা চাইলে এখনও যুদ্ধে বিজয় লাভ করা সম্ভব। শান্তি-চুক্তিতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তারা আমেরিকাকে এই যুদ্ধে নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, তবে এর বিনিময়ে তাদের হাতে প্যালেস্টাইনের চাবি তুলে দিতে হবে। কোনো উপায় না দেখে ব্রিটেন এই শর্তে রাজি হয়ে যায়। এরপর আমেরিকা তাদের রণতরি নিয়ে এগোতে শুরু করে। যুদ্ধের মোড় এখানেই পালটে যায়। পরবর্তী ছয় মাসের মাথায় কেন্দ্রীয় শক্তি পরাজিত হয়।

সাধারণ আমেরিকানদের মনে জার্মানবিরোধী চেতনা জাগিয়ে তুলতে সেখানকার ইহুদি মালিকানাধীন পত্রিকাগুলো একের পর এক মিথ্যা সংবাদ প্রচার শুরু করে। যেমন : জার্মানি একটি সন্ত্রাসী দেশ, তারা হান দস্যু, তারা রেডক্রসের নার্সদের বুকে গুলি ছোড়ে, নাবালক শিশুদের হত্যা

করে ইত্যাদি ইত্যাদি। মুহূর্তে যেন আমেরিকার সাধারণ জনগণ জার্মানদের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে। যুদ্ধ শেষে শুরু হয় নতুন প্রচারণা। যেমন : জার্মানিতে ইহুদিরা মানবেতর জীবনযাপন করছে, সেখানে মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে, তাদের ওপর সাধারণ মানুষ যুদ্ধের ঝাল মেটাচ্ছে, তারা আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর সাহায্যের আশায় বসে আছে এবং সবাই যেন তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে।

এ নিয়ে ১৯১৯ সালে প্যারিসে শান্তি আলোচনার আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিল ১১৭ জন ইহুদি প্রতিনিধি, যাদের অনেকেই জার্মান নাগরিক। আলোচনার এক পর্যায়ে তারা ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্যালেস্টাইন দাবি করে। জার্মান সম্রাট তখন মাথায় হাত দিয়ে বলেন– 'এই কি ছিল যুদ্ধের কারণ?' তিনি বুঝতে পারলেন, রাশিয়া থেকে বিতাড়িত একদল বিশ্বাসঘাতককে নিজ দেশে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এর কিছুদিন পর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্রিটেন থেকে আসে বেলফোর ঘোষণা।

'... A Jewish Defector Warns America (1961) '

Benjamin Freedman

ইহুদিরা পৃথিবীর প্রাচীন একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। তাদের রয়েছে প্রায় তিন হাজার বছরের ইতিহাস। তবে এই ইতিহাস যতটা না ধর্মকেন্দ্রিক, তার চেয়ে বেশি জাত ও বংশকেন্দ্রিক। জনসংখ্যায় অতি নগণ্য হয়েও আধিপত্য ও সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের দিক থেকে তারা কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। তাদের প্রসঙ্গ সামনে এলেই যেন বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিমের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয়। এর পেছনে রয়েছে ঐতিহাসিক নানা দ্বৈরথ, গত কয়েকশো বছরের অসংখ্য ষড়যন্ত্র এবং প্যালেস্টাইনের ওপর চলমান নির্যাতন। যারা ছিল একসময়কার সবচেয়ে নিপীড়িত জাতি, তারাই আজ পৌঁছে গেছে নিপীড়কের নেতৃত্বে। সেই ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে তাদের যে উত্থান শুরু হয়েছে, তার ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। যে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মতো দেশগুলো একসময় ইহুদিদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত, তারাই আজ তাদের অধিকার ও নিরাপত্তার দায়িত্বে কাজ করছে। কিন্তু তাদের এই উত্থান কীভাবে ঘটল? কীভাবে তারা আজকের ক্ষমতাধর জাতিতে পরিণত হলো? কোন সে অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে তারা শাসন করে যাচ্ছে পুরো বিশ্বকে?

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পরে দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের উন্মাদনা। নতুন প্রযুক্তির ছোঁয়ায় শিল্প-কারখানগুলোর চিত্র পালটে যেতে শুরু করে। পরিবর্তনের হাওয়ায় বদলে যায় বিশ্ব অর্থনীতি এবং সাধারণ মানুষের জীবনপ্রবাহ। সে সময় পৃথিবী লক্ষ করে নতুন এক শক্তির আবির্ভাব– 'জায়োনিজম'। বলে রাখা ভালো, জায়োনিজম পৃথিবীর বহু প্রাচীন একটি মতবাদ। তবে জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের স্বপ্নে ১৮৯৭ সালে Theodor Herzl ও Max Nordau-এর হাত ধরে এই মতবাদটি একটি সাংগঠনিক রূপ পায়; 'World Zionist

Organization'। নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলে কীভাবে তারা বিশ্বজুড়ে অসংখ্য ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করেছে, তা অল্প কথায় এই অংশে কখনো উপস্থাপন করা সম্ভব নয়।

ইহুদিরাই তো পুঁজিবাদ এবং আধুনিক ব্যাংকিং শিল্পের জন্মদাতা। সুদভিত্তিক অর্থ-বাণিজ্যকে কাজে লাগিয়ে তারা সুকৌশলে কেড়ে নিয়েছে জ্যান্টাইল সমাজের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। শেয়ারবাজারগুলোতে তাদের সংঘবদ্ধ দৌরাত্ম্য কত বিনিয়োগকারীকে যে পথের ফকির বানিয়েছে, তার কোনো হিসাব নেই। বিশ্ব শ্রমবাজার তাদের কণ্টকময় থাবায় জর্জরিত। লোহা, ইস্পাত, তামা, কপার, নিকেল ও স্বর্ণ-রৌপের খনিগুলো নিজেদের কবজায় নিয়ে কাঁচামাল শিল্পের ওপর চূড়ান্ত আধিপত্য সৃষ্টি করেছে। জনমত নিয়ন্ত্রণে চারদিকে গড়ে তুলেছে অসংখ্য পত্রিকা প্রতিষ্ঠান। চারদিকে বিপ্লব, আন্দোলন এবং বিভাজনের বীজ ছড়িয়ে দিতে সুকৌশলে মানুষের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছে ভয়ংকর সব মতবাদ। চলচ্চিত্র ও শিল্পকলায় অশ্লীলতার সংযোজন ঘটিয়ে যুব সমাজের নৈতিকতাবোধ ধ্বংস করে ফেলেছে। সেইসঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থায় ঢুকিয়ে দিয়েছে নাস্তিকতার বীজ।

হেনরি ফোর্ড ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম ধনী ব্যবসায়ী; ফোর্ড মোটর কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। শিল্প বিপ্লবের সেই সময়টিতে অন্যদের মতো তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন– অদৃশ্য সেই শক্তি তার প্রতিষ্ঠানেও থাবা বসাতে চাইছে। কিছু করতে না পারলে তার ভাগ্যেও অন্যদের মতো দেউলিয়ার থালা ঝুলবে। ব্যবসায় কার্যক্রমের পাশাপাশি তিনি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও পরিচালনা করতেন, যার নাম ছিল– *The Dearborn Independent*।

তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, এই অদৃশ্য শক্তির মুখোশ বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোচন করেই ছাড়বেন। সে সময় একজন আমেরিকান হয়ে ইহুদিদের বিরুদ্ধে মুখ খোলা যেনতেন কাজ ছিল না। বইটি পড়লেই এর কারণ জানতে পারবেন।

১৯২০ সাল থেকে তিনি ইহুদিদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রের ওপর একের পর এক তথ্যপূর্ণ আর্টিকেল প্রকাশ করা শুরু করেন। এর ফলে তার পত্রিকার জনপ্রিয়তা খুব দ্রুতই ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পরে। সর্বত্র এটি নিয়মিত পঠিত হতে শুরু করে। ১৯২২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হওয়া সেরা ৮০টি আর্টিক্যাল নিয়ে তিনি একটি বই প্রকাশ করেন– *The International Jews*।

বইটি খুব দ্রুতই ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন লাইব্রেরিতে ছড়িয়ে পড়ে। তখন এমনিতে জার্মান ও রাশিয়ানরা ইহুদিদের ওপর ক্ষেপে আছে, তার ওপর প্যালেস্টাইন ইস্যু তো রয়েছেই। এমতাবস্থায় এই বইটি সাধারণ মানুষকে যে ইহুদিদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে পারে, তা

তারা ভালো করেই আঁচ করতে পেরেছিল। সত্যের মতো এমন কোনো আধুনিক অস্ত্র নেই, যা সাধারণ মানুষকে এক করতে পারে। এ কারণে ইহুদিরা সত্যকে এত বেশি ভয় পায়।

শত ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার পরও যখন ইহুদিরা বইটি বন্ধ করতে পারছিল না, তখন আমেরিকান প্রশাসন এবং প্রেসিডেন্ট-এর বিশেষ ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে ১৯২৭ সালে ফোর্ড-এর বই ও প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান সিলগালা করে দেয়। তারপর থেকে সর্বত্র এর প্রচারণা নিষিদ্ধ করা হয়। মুদ্রিত যে কপিগুলো তখনও পৃথিবীর বিভিন্ন লাইব্রেরিতে পড়ে ছিল, সেগুলো ধ্বংস করে দেয়। ফোর্ড-এর ওপর প্রশাসনিক বল প্রয়োগ করা হয়, যেন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বইটি প্রকাশের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিছুদিন পর তার ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি ফলাও করে চারদিকে প্রচার করা হয়। সাথে এও যোগ করা হয়– এই বইয়ের অধিকাংশ বিষয় ছিল মনগড়া, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে তারা কিছুটা হলেও জনমনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

এরপর কেটে গেছে দীর্ঘ সময়। ১৯৪০ সালে Gerald L.K. Smith ফোর্ড-এর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। ততদিনে তার মোটর গাড়ির জনপ্রিয়তা বিশ্বব্যাপী তুঙ্গে। আলোচনার এক পর্যায়ে বইটির প্রসঙ্গ চলে এলে ফোর্ড বলেন, তিনি বইটি প্রকাশের জন্য কখনোই ক্ষমা চাননি। Mr. Smith এ কথা শুনে প্রচণ্ড অবাক হন! তিনি বলেন– ‘তাহলে সে সময় আপনার ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি যে চারদিকে ফলাও করে প্রচার করা হয়!’ উত্তরে ফোর্ড সাহেব বলেন– ‘সব মিথ্যা, আমি কখনো ক্ষমা চাইনি। আমার কর্মচারী Harry Bennett সেই ক্ষমাপত্রে দস্তখত করেছিল, আমি নই। আমি এই বইটি আবারও প্রকাশ করতে চাই, তবে তা আদৌ সম্ভব হবে কি না জানি না।’

এই হলো বইটির প্রেক্ষাপট। বইটির অধিকাংশ কপি বাজার থেকে গায়েব করে দেওয়া হলেও তারপরও কিছু কপি সাধারণ মানুষের কাছে ছিল। তাদের উত্তরসূরিগণ পরবর্তী সময়ে বইটির ডিজিটাল ভার্সন অনলাইনে আপলোড করে বলেই বইটি পুনরায় পাঠকদের কাছে ফিরে এসেছে। যারা বিশ্বে নানান ভাষায় বইটি অনূদিত হয়েছে। কোটি মানুষ বইটি পড়ছে। বাংলা ভাষায় বইটি পড়তে আপনাকে স্বাগতম।

সূচিপত্র

ইহুদি ইতিহাস	১৫
ইহুদি বিতর্ক : সত্য না কল্পকাহিনি	২৯
আন্তর্জাতিক ইহুদি ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব	৪৬
প্রকাশনা শিল্পে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র	৭৮
বলশেভিক বিপ্লব এবং ইহুদি ষড়যন্ত্র	৮৮
জাতিতাত্ত্বিক পরিচয় : ইহুদি জালিয়াতি	১১২
শিল্প সংস্কৃতি : ইহুদি ছোবল	১৩২
অর্থ : ইহুদি ক্ষমতার মূল উৎস	১৭৫
জায়োনিস্টরাই কি আর্মাগেডনের জন্ম দেবে	১৮৯
দাঙ্গাবাজ ইহুদিদের অপকর্মের চিত্র	২০০
আমেরিকার অর্থব্যবস্থায় ইহুদি দৌরাত্ম্য	২১৫
ইহুদি ঔদ্ধত্যপনা	২৩৬
ইহুদি সমাজে ঘেটো ব্যবস্থা	২৬২
জ্যান্টাইলদের প্রতি ইহুদি দৃষ্টিভঙ্গি	২৮৫

‘ইহুদিদের ব্যতিক্রমধর্মী বেশকিছু নৈতিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন : কঠোর শারীরিক শ্রমের প্রতি অনীহা, সন্তান উৎপাদনে অধিক আগ্রহী, তীব্র ধর্মীয় প্রেরণা, দৃঢ় পারিবারিক বন্ধন, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে টিকে থাকার অসাধারণ ক্ষমতা, সমবেত উপায়ে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার সক্ষমতা, যুদ্ধের মাঠে জীবন দেওয়ার অসীম সহাসিকতার অধিকারী, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় উপায়ে শোষণধর্মী মানসিকতা, অর্থনৈতিক বিষয়ে নিজেদের ফটকা পরিকল্পনাসমূহ অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা, প্রাচ্যের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা, সামাজিক প্রতিপত্তি নিয়ে অন্যদের ওপর অহংকার প্রদর্শন এবং সাধারণের চেয়ে উচ্চতর মেধাশক্তির অধিকারী হওয়া।’ *-The New International Encyclopedia*